اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ
اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا
بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا
بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ
وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَ
مَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ
مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾
بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ
بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ
اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর। (৪৬) তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ – পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুমিনদের জন্যে সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র ঃ আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তেলাওয়াত ও নামায কায়েম করা উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فحشاء শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মুমিন কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে منكر এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহ্‌বিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে منكر বলা যায় না। منكر ও فحشاء শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ্ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ ঃ একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, সে গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী اقامت صلوٰة হতে হবে। اقامت এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اقامت صلوٰة এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। অর্থাৎ, শরীর, পরিধানবস্ত্র নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জমাআতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহ্‌র সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন

তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তওফীক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন, من لم تنهه صلوته عن الفحشاء والمنكر فلاصلوٰة له অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ্ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।— (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ্ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহ্‌র স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশেও স্মরণ করেন।

(فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ) আল্লাহ্‌র এই স্মরণ এবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ্ স্বয়ং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

– অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণতঃ কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا – কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে – তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া জায়েয, যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۭ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ – অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নহ্‌লে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে— আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অন্তরায় থাকা উচিত নয়। এরশাদ হয়েছে وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইনজীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ্

তাআলা এইসব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্‌জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি। যেগুলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নাই এবং মিথ্যাও বলতে নেই ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইন্‌জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল آمَنَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ, আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীর গ্রন্থসমূহে তফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ, আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইন্‌জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তুর নয়।

নিরক্ষর হওয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি বড় মু'জেযা ঃ আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সপ্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জেযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন কিতাবধারীদের সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জেযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে من محمد عبد الله ورسوله লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাযা (রাঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে من محمد عبد الله লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বোঝে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও 'সে লিখেছে' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মু'জেযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লেখা জানতেন— বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ
وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَ
إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ
صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ
رِزْقَهَا ۖ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِن
سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن
سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

(৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। (৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ, যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ঃ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওযর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও এবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহ্র জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবতঃ দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হেফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا .... - হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুযী রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই রিযিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ, চিন্তা

কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীব-জন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তাআলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়— বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহ্র দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহ্রই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজ-সরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্র দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? ঃ হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরযে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়; মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হত না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হত। সূরা নিসার ৮৯ আয়াতে অর্থাৎ, حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কলেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশে রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন এই মর্মে আদেশ জারী করেন, لاهجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফেকাহ্বিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন ঃ

মাসআলা ঃ যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনতঃ গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা ঃ কোন দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরী নয়; বরং 'দারুল ফিস্ক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসনাদে আহমদে আবু ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, البلاد بلاد الله والعباد عباد الله حيثما اصبت خيرا فاقم অর্থাৎ, সব নগরীই আল্লাহ্র নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহ্র বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গোনাহ্ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।—(ইবনে কাসীর)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ
يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ
مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
لَمَّا جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

سورة الروم مكية وهي ستون اية وست ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ
قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾
بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

(৬৪) এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। সত্বরই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? (৬৯) যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

সূরা আর-রূম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৬০

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে, (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহ্‌র হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ্ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিতে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ; তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ, সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

– এখানে حيوان শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।— (কুরতুবী)

এতে পার্থিবজীবনকে ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিবজীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহ্‌কে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্যে কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই ডাকে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবূল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ — আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহ্‌কেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ্

তাআলা কাফেরেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা, সে مضطر তথা অসহায়। আল্লাহ্ তাআলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন।— (কুরতুবী)

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ, কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا ..... উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্ তাআলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ্ তাআলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হত যে, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।— (রুহুল-মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্র কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا – এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জেহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জেহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ, যেসব ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন্ পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কূল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা জেহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন। অর্থাৎ, যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্‌ম বাড়ে ঃ এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদ্দারদা বলেন, আল্লাহ্ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্যে যারা জেহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্যে আমলও সহজ করে দেই।—(মাযহারী)

সূরা আল-আনকাবূত সমাপ্ত

সূরা আর-রূম

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী ঃ সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্যে তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্যে উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রূম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসকিদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খৃস্টান আহ্লে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি—যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন ঃ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .... আহ্লে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনষ্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহ্লে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসকিদের মোকাবেলায় পারজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবেলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।—(ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই

রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্‌ফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি! যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবু বকর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্যে بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবু বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল।—(ইবনে জরীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্‌ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবু বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবু ইয়ালা ও ইবনে আসকেরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে: هذا السحت تصدق به —এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।—(রূহুল-মা'আনী)

জুয়া : কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শয়তানী অপকর্ম' আখ্যা দেয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

ازلام ও ميسر বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই ইবনে খাল্‌ফের সাথে যে দু'তরফা লেন-দেন ও হার-জিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই মাল সদকা করে দেয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سحت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফেকাহ্‌বিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পছন্দ করতেন না। তাই আবু বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেয়ার আদেশ দেন। এটা এমন-যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে سحت শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, প্রথমতঃ হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ্ বলে স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ্ মেনে নেয়া হয়, তবে سحت শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, كسب الحجام سحت এখানে অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে سحت — এর অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে-আসীর 'নেহায়া' গ্রন্থে سحت শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফেকাহ্‌বিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ — অর্থাৎ, যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহ্‌র সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষতঃ যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবেলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।—(রূহুল-মা'আনী)

وَعْدَ اللّٰهِ ۙ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝٦ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ
الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَ
اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا
فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ
كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ
مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ
اَسَاۗءُوا السُّوْۗاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠
اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١ وَيَوْمَ
تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
مِّنْ شُرَكَاۗىِٕهِمْ شُفَعٰۗؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَاۗىِٕهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٣
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝١٤ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝١٥

(৬) আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। (৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে; তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (১১) আল্লাহ্ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে;

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

—অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, দালান-কোঠা কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ কিভাবে আহরণ করবে—এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ, একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্যে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্যে এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলাবাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ —এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে نكرة কে ظَاهِرًا এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না—এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় ঃ কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ নয়। কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্যে আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—জীবনের লক্ষ্য বানায় না। اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا .... — আয়াতের অর্থ তাই।

উল্লেখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্যস্বরূপ। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ্ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নেয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে

এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একথাও বলাবাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়ি-পাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। একথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসি-খুশী জীবন-যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন একসময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এই সময়েরই নাম কেয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগত আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ —এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশে শাম ও ইয়ামন সফর করে। এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তদ্দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। তারা ছিল তৎকালীন সুলভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ, তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ - يُحْبَرُونَ শব্দটি حبور থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ অর্থাৎ, দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে যে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছেন এগুলোর সবই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ
فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ
تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۭ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ
لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ
مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۗؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

(১৬) আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে। (২০) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য ! নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শন ঃ রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অন্বেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন—তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

سبحوا الله শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে, অর্থাৎ, حِيْنَ تُمْسُوْنَ - অর্থাৎ, সন্ধ্যায় حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ, সকালে وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —এই বাক্যটি প্রমাণ হি মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরী। কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষভাগে وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আসরের সময় সাধারণতঃ কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ্ অথবা নামায সম্পন্ন করা স্বভাবতঃ কঠিন। এ কারণেই কোরআনে صلوٰة وسطى তথা আসরের নামাযের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে—

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। যিকরের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা নামায ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআনে পাঞ্জেগানা নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ, حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিবের নামায, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামায, عشيا শব্দে আসরের নামায এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে যোহরের নামায উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে ; অর্থাৎ, وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ হযরত হাসান বসরী বলেন, حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى —হযরত ইবরাহীম (আঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হযরত ইবরাহীমের অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে

বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে, তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে, তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেয়া হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অতঃপর চতুষ্পার্শস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, এবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত কায়েম হওয়ার বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তাআলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

খোদায়ী কুদরতের প্রথম নিদর্শন ঃ মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ্ তাআলা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, একথা হযরত আদম (আঃ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

খোদায়ী কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন ঃ দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাআলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সংগিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দু'টি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ্র পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্যে এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا — অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য ঃ আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা ; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই করা হয়েছে। অর্থাৎ, একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহ্ভীতি যুক্ত করে দেয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র اَتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ — অর্থাৎ, এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লেখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়— বহু নিদর্শন।

খোদায়ী কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন ঃ তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্য জনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানব জাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী; ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা এবং বহুবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ —অর্থাৎ, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

খোদায়ী কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন ঃ মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাত্রির সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় ; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান। আমরা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে, কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিযিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ — অর্থাৎ, যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণও সম্ভবতঃ এই যে, দৃশ্যতঃ নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যেই উপকারী, যারা পয়গম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়— কোন হঠকারিতা করে না।

খোদায়ী কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন ঃ পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে উহার পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ —অর্থাৎ, এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۡ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ۝ وَلَهٗ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ضَرَبَ لَكُمْ
مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۭ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
مِّنْ شُرَكَاۗءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۗءٌ تَخَافُوْنَهُمْ
كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَاۗءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ
مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۭ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ فَاَقِمْ وَجْهَكَ
لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۭ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا
تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا
دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

(২৫) তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের আমি যে রুযী দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যেরূপ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবে আমি সমঝদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে। অতএব, আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে বোঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৩২) যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খোদায়ী কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন ঃ ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্ তাআলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ্ তাআলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্যে এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى — যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার **مثل** বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলার যে **مثل** আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ কিন্তু **مثال** ও **مثل** থেকে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে তওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতই মানুষ ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। কোন ক্ষুদ্র ও মামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহ্র সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর?

২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার, কিন্তু প্রতিপক্ষ কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

৩০ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন — فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ — **فطرة الله** বাক্যটি পূর্ববর্তী **فاقم** বাক্যের ব্যাখ্যা এবং **دين حنيف** — এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, **دين حنيف** হচ্ছে **دين فطرت**। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা

হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। (এক) এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خلق الله বলে পূর্বোল্লেখিত فِطْرَتَ اللّٰهِ -কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্র এই ফিতরকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতা-মাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ্ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফের বেশী পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আঃ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আঃ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী। তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হল না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে। কারণ, ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ্ হাদীসের অনুরূপ ফেকাহ্বিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতা-মাতা কাফের হলে সন্তানকে কাফের ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপুশতী 'মাসাবীহ্' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আঃ)-এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার বাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতা-মাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়ার যে কথা বোখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যতঃ মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মোহাদ্দিস-ই-দেহলভী (রহঃ) মেশকাতের টীকা 'লুমআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ্' গ্রন্থে লিখিত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রহঃ)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন মন ও মেজাযের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى —আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ, যে জীবনকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথ প্রদর্শন। আল্লাহ্ তাআলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ —উল্লেখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ — আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে আমার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি এবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরয ঃ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ, খবর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে। অর্থাৎ, পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমনসব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশীর ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ —পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا
بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا
بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ
الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ۟ا
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن
شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

(৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব, মজা লুটে নাও, সত্বরই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোন দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র ও মহান। (৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।

প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়েম করতে হবে। কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ — অর্থাৎ, যারা শিরক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا —অর্থাৎ, এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شيعة শব্দটি شيعة –এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شيعة বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাব ধর্ম ছিল তওহীদ। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ —অর্থাৎ, প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ — পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এবং হাসান বসরী (রহঃ)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না ; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) আত্মীয়-স্বজন, (দুই) মিসকীন, (তিন) মুসাফির। অর্থাৎ, আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্যে ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ্ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা, প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবী ; কোন অনুগ্রহ নয়।

ذوى القربى বলে বাহ্যতঃ সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহ্রাম হোক বা না হোক। حق বলেও ওয়াজিব—যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হক—সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব

পাওয়া যায়। এমন কি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন ঃ যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয়; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনাদানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হল আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য।—(কুরতুবী)

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকতে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ —এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণতঃ একে অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে-ও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশী দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধন-সম্পদ আত্মীয়দের ধন-সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশী নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহ্‌র কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাক এই 'বেশী'-কে لِّيَرْبُوَا۟ (সুদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

মাসআলা ঃ প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্যে নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগমত এর প্রতিদান দেবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কেউ কোন উপঢৌকন দিলে সুযোগমত তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস।—(কুরতুবী) তবে এই প্রতিদান এভাবে দেয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ — অর্থাৎ, স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ্ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ, তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ্ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ্; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহ্‌র কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ্ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়। কোন কোন গোনাহ্‌র কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহ্‌র কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। বরং অনেক গোনাহ্ তো আল্লাহ্ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে, لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا — যাতে আল্লাহ্ তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা, পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ্ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্যে উপকারপ্রদ ও একটি বড় নেয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে ঃ তাই কোন কোন আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গোনাহ্‌র কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কেয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহ্‌গার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শাকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না; বরং সমগ্র মানব জাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। —(রূহুল-মা'আনী) কারণ, প্রথমতঃ একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্দ্বারা সব মানুষই কম-বেশী প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব ঃ সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত। কাফেরকে তার সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মুমিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মুমিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل—অর্থাৎ, দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ্ হাদীস বাহ্যতঃ আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহ্‌র কারণে হত, তবে ব্যাপার উল্টো হত।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহ্‌কে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোন বিপদ আসলে তা একমাত্র গোনাহ্‌র কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ
يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ
فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾

(৪২) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্যে সে-ই দায়ী এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (৪৫) যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে যাতে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফেরদের ভালবাসেন না। (৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল।

অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ওষুধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এস্থলে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষুধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না; ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহ্‌র কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহর আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গোনাহ্ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ্ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ্ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকে গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেনি; এবং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না. সেসব বিপদাপদকে সাধারণতঃ গোনাহ্‌র এবং বিশেষতঃ প্রকাশ্য গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যেও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহ্‌গার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। হাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ্ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার ; (এক) বাহ্যিক ও (দুই) আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য-সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, মৌসুমী বায়ু যা উপরের বায়ুতে পৌছে বরফে পরিণত হয়, অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লেখিত কারণ হতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম-উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু

কারণও প্রাকৃতিক-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্যে। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহও আপন-আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্যে সুখকর হয় এবং কারও জন্যে বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ড এবং বিপদাপদও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণমাত্রায় সুখ ও শান্তিলাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে, কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবী করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণমাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ, তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী-রসূল ও ওলীয়ে কামেলের জন্যে প্রতিকূল করে তাঁর পরীক্ষার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য ঃ বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহর শাস্তি দেয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফফারার জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষুধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মত সন্তুষ্ট থাকে; বরং এর জন্যে সে টাকা-পয়সা ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমন কি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এক পরিচয় এই বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ্র প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও এস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ খোদায়ী গযব ও আযাবের আলামত।

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

— অর্থাৎ, আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যতঃ এর ফলে কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে জেহাদ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জেহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে — إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا অর্থাৎ, তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তাআলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন—যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহ্র বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ্ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ্র সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্ তাআলা দয়াবশতঃ সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন। অতএব, এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ
أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ
لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ
الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا
يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ
ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ
بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

(৫০) অতএব, আল্লাহ্‌র রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান। (৫৪) আল্লাহ্‌, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হত। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না।' (৫৭) সেদিন জালেমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না। (৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কিনা, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কিনা-সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সূরার একটি বড় অংশ কেয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সতেচন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোন ভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে সে শক্তিলাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ — বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও তা কতটুকু দুর্বল ; বরং তুমি তো ছিলে সাক্ষাত দুর্বলতার প্রতীক। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশী চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয় ; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপেও নয় ; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা তার বিকাশ লাভের জন্যে পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই ঃ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا — অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হল। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতা-পিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে

তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজন চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবনকাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নুমনা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً — এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?)-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্ বলেন, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً —হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং একসময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়—নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ — অর্থাৎ, এগুলো সব সেই রাব্বুল ইয্যতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছেঃ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ —অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশী অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কেয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কেয়ামত এসে হাযির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কেয়ামত তাদের জন্যে সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে, কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় সেই আযাব আযাব নয়—সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ
اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾
وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ
فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۭ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى
فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۗبَّةٍ ۭ
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

(৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ্ জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। (৬০) অতএব, আপনি সবর করুন। আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াত। (৩) হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে। (৪) যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) এসব লোকই তাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আগত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম। (৬) একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু' কান বধির। সুতরাং ওদেরকে কষ্টদায়ক আযাবের সংবাদ দাও। (৮) যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতে ভরা জান্নাত। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্র ওয়াদা যথার্থ। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (১০) তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরে আল্লাহ্র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি ? ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশী থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ —অর্থাৎ, তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা, রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণমাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যক হবে না। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ..... —আয়াতের অর্থ তাই। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে—মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন এরশাদ হয়েছে,

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না ঃ এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে? তখন সে বলবে, هاه هاه لا ادرى —অর্থাৎ, হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ্' বলে দেয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহ্র সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পরবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

সূরা আর-রূম সমাপ্ত

সূরা লোকমান

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে যাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে যাকাতের নেসাব নির্ধারণ,

পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ – اشترى শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اشتراء শব্দ ব্যবহৃত হয়। اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামুদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিস্‌সা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস ফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ, এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ছুতা পেয়ে গেল।— (রূহুল-মা'আনী)

দুররে মনসূরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে; এতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্‌সা-কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে-নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اشتراء শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اشتراء শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বাক্যটিতে حديث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لَهْوَ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لَهْوَ বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لَهْوَ বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে তফসীর করা হয়েছে গান-বাদ্য করা।— (হাকেম, বায়হাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্‌সা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ্‌র এবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বোখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, لهو الحديث هو الغناء واشباهه – অর্থাৎ, لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহ্‌র এবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। ইবনে জরীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন।— (রূহুল-মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ আয়াত নাযিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ঃ প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মকরূহ হওয়া।—(রূহুল-মা'আনী, কাশ্‌শাফ) আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল ; কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা, খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। বস্তুতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া তো জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যতঃ ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলা নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যতঃ সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ এবং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ, যাতে কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মকরূহ তানযিহী অর্থাৎ, অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়।

(১) যে খেলা দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর) যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ

لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ। যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতে সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও না-জায়েয ঃ বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

(৩) যেসব খেলায় কুফর নেই এবং কোন প্রকার গোনাহ্ নেই, সেগুলো মকরূহ্। কারণ, এতে অনর্থক কাজে শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ঃ উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা ঃ পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে—তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনামতে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, 'মুমিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সূতা কাটা।'

সহীহ্ মুসলিমও মুসনাদে আহমদে হযরত সালাম ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।— (আবু দাউদ)

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। (বায়হাকী, কান্য) কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক — এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে "তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।— (আবু দাউদ) এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ ঃ এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।— (নসবুররায়াহ্)

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। (আবু দাউদ, কান্য) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমন কি নামায, রোযা ও অন্যান্য এবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান ঃ কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ - এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবিগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোন খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়।

কোরআন পাকের لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ আয়াতে ইমাম আবু হানীফা, মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ زور শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান বর্ণিত হযরত আবু মালেক আশ আরীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ্

তাআলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।''

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম।— (আহমদ, আবু দাঊদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, ''যখন জেহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশে শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লাল বর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমিধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে, যেমন কোন মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।''

এতদ্ভিন্ন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না-জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ঃ অপরপক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত না হয় তবে জায়েয।

কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাঁদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সাঃ)-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোন স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণতঃ কোন স্তম্ভ থাকে না। তাহলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?

এর উত্তর এই যে, কোরআনে করীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে— এতে পৃথিবী বাহ্যতঃ গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়—যা নির্মাণের জন্য সাধারণতঃ স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা —কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারগণের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন-হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কোন কোন আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ্ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌঁছে সেজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে, আকাশ পূর্ণ গোলাকার হওয়ার পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা, কেবল এ অবস্থাতেই এর ঊর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে।— পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বা নীচ বলা চলে না।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ
الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ
لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ
اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ
اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ
بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ
سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾ يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا
اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

(১১) এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি; অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জালেমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (১৩) যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল : হে বৎস, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু' বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (১৬) হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ্ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৭) হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব (আঃ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আঃ)- এর সময়েও বেঁচে ছিলেন।

তফসীরে দুররে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন—কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ্, আহমদ ইবনে জরীর ও ইবনুল মুন্‌যির প্রমুখ 'যুহ্দ' নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর নিকটে তাঁর (লোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁটবিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন—(ইবনে কাসীর)

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ, কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিন জন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত—হযরত বেলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহ্জা' এবং হযরত লোকমান (আঃ)।

হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন : ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম কাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। — (মাযহারী)

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ্ পাক হযরত লোকমানকে নবুওয়ত ও হেকমত (প্রজ্ঞা)-দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই (প্রজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরয করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে (প্রজ্ঞা) নবুওয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন ; যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো।— (ইবনে কাসীর)

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ

أَنِ اشْكُرْ لِي (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)-তা এলহামের মাধ্যমেও হতে পারে; যা আল্লাহ্‌র ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি। — (কুরতুবী)

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি-যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো? লোকমান বলেন, হাঁ-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, খোদার গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দু'টি কাজ-(এক) সর্বদা সত্য বলা, (দুই) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান বলেছেন যে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই: নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। — (ইবনে কাসীর)

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ্ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ্ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহ্‌র অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম)। পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য-উপদেশাবলী ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছিলেন। শিরক্ যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশে আল্লাহ্ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরয: আল্লাহ্ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহ্‌র) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক্ এমন গুরুতর অন্যায় মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়।

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন।— নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম তাই। অতঃপর وَإِن جَاهَدَاكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি: যদি পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাঁদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক— প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا—অর্থাৎ, দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাঁদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাঁদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাঁদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারকতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে: অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন—মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। يَٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَ
إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

(১৯) পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে ; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে। (২১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র দিকে। (২৩) যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যাকিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বল্পকালের জন্যে ভোগবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

থাকা—ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে ঃ অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলীর পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন, নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার এরশাদ রয়েছে — "নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।" এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ —অর্থাৎ হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা—এ সবই নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত।

চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে ঃ ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম—ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবনব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ— এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখ। (এক) নিজের পরিশুদ্ধি, (দ্বিতীয়) গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি— এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম—সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশে সৎকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ – অর্থাৎ, এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, তাতে ধৈর্যধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে ঃ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ — وَلَا تُصَعِّرْ – এর উৎপত্তি صعر ধাতু থেকে –যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি—যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের খিচুনী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না— যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا — مرح শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সহিত বিচরণ করা—অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর—নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ — আল্লাহ্ পাক কোন অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ –অর্থাৎ, নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড়-ধাপসহও চলো না, যা বভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদাহানিকর

(জামে সগীর হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত)। এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না—যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রীষ্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকটির নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বললো যে, সে একজন আলেম ও ক্বারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ফরমান যে, খলীফা ওমর (রাঃ)-এর চাইতে অনেক উন্নতমানের ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন তখন মধ্যম গতিতে চলতেন। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ — অর্থাৎ, তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এমাত্র ক্বারীকে আযম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ অর্থাৎ, চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকারভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (৪) উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রাঃ) ফরমান—আমি আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট মানুষের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার কালে আঁ হযরত (সাঃ)- এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ 'নবীজী (সাঃ)-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো—তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নীরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপুত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহঙ্কার, (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

মহান আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত মুমিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ -অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান, সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تسخير অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেয়া হয়েছে—তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে, যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেয়া হয়েছে —ফলে তা মানব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত—কিন্তু প্রতিপালকোচিৎ হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়নি। যেমন, নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি ; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়ই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো ; অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ্ পাক এসব বস্তু মানবসেবায় নিয়োজিত অবশ্যই রেখেছেন ; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً - اسباغ অর্থ পরিপূর্ণ করে দেয়া। যার অর্থ আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য – অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা—এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেয়া, আল্লাহ্-রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা—এসবই প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত—যথা ঈমান, আল্লাহ্ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ — এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নেয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,—কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন—যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ্ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمٰتُ اللّٰهِ - র ভাবার্থ আল্লাহ্ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলী।—(রূহ ও মাযহারী) আল্লাহ্ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্ত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহ্র প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে—সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত—যেখানে বলা হয়েছে—'আল্লাহ্র মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে—কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।' এ আয়াতে بِمِثْلِهٖ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্তও হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা অনুরূপ চতুর্থটা—মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ্র মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে —কিন্তু كَلِمٰتُ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্র বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত—কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাযিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন তখন কিছুসংখ্যক ইহুদী পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (অর্থাৎ, তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসংগে আপত্তির সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী হযরত (সাঃ) বললেন—আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ, আমাদের জাতি এবং ইহুদী-খৃষ্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো—আমাদেরকে তো আল্লাহ্ পাক তওরাত প্রদান করেছেন —যা تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ, সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ ..... (ইবনে-কাসীর)

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ
عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ
الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

(২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩২) যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাঁটি মনে আল্লাহ্কে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩৩) হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উপরোল্লেখিত ৩৩নং আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ -অর্থাৎ, হে মানব জাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণাবাচক নামের স্থলে 'রব'—(পালনকর্তা) বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্কে ভয় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে, সেরূপ ভয় নয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা—সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এক্ষেত্রে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন, পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শত্রু বা ক্ষতিসাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা এবং ওস্তাদের নির্দেশ অনুসরণ ও পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে —যেন আল্লাহ্ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর নবীর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ

অর্থাৎ, সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে পারবে না।

এখানে ঐ শ্রেণীর পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে একজন মুমিন, অপরজন কাফের। কেননা মুমিন পিতা কিংবা পুত্র স্বীয় কাফের পুত্রের কিংবা পিতার শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত—যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে করীমে রয়েছেঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে—আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে ; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে —যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ অর্থাৎ, তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ

করবে। যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ ৩৩ ও ৩৪নং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েত সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না— তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে।— (মাযহারী)

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

অর্থাৎ, কেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ, কোন্ বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র ; কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে, তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানযদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আনআমের আয়াতে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)।

এলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) তাঁর তফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যদ্দ্বারা উল্লেখিত সব ধরনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। তা এই যে, গায়ব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্ পাকের যাত ও সিফত, সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে এলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশাবলী— যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কোন্ কোন্ কাজ পছন্দনীয়, কোন্গুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়। এসব বস্তু গায়ব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ اكوان غيبية (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা নবী ও রসূলগণকে (সাঃ) প্রদান করেছেন। যার উল্লেখ কোরআনে করীমে এরূপভাবে রয়েছে—

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার —অর্থাৎ اكوان غيبية (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী)—এর পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ্ কাউকে প্রদান করেন না—তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করেন। যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে এল্মে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না; বরং গোপন বার্তা বলা হয়।

আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঃ এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহ্রই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই, একথা বলে দেয়াই বাহ্যতঃ বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ্ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কেয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে— إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কেয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাল্টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় বস্তুর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্যবিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। যা হযরত থানবী 'বয়ানুল কোরআনে' বর্ণনা করেছেন।

যার সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, শেষোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ, আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে— যা মানুষের নিজ সত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা, যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টিবর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্ততঃ যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ—যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যতঃ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ—যার এখনো অস্তিত্বও নেই, তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের

নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতঃই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে হাঁ সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তাআলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কেয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়—এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়—এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সন্তান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ্ পাকের এলমের উল্লেখ রয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ (অর্থাৎ, মার্তগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ্ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়।

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢ اَمْ
يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣ اَللّٰهُ
الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ
اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ
يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥
ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ
رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ۝٩ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ
خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠

সূরা সেজদাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩০

পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু আল্লাহ্র নামে আরম্ভ।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) এ কিতাবের অবতরণ বিশ্বপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। (৪) আল্লাহ্, যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৯) অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ্ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) তারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।

সূরা সেজদাহ

مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ এখানে نَذِيْرٍ — ভয় প্রদর্শক বলে রসূলকে (সাঃ) বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ) -এর পূর্বে মক্কার কুরাইশগণের নিকট কোন নবী আগমন করেননি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি। কেননা, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে যে, وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ —অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার মাঝে আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে কোন ভয় প্রদর্শক এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِيْرٌ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌঁছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা যথাস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং আল্লাহ্ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবু হাইয়্যান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ণ হয়নি। যখনি এক নবুওয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে নবুওয়তভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত নগণ্যসংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবতঃ তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই পৌঁছেছিল, কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন — হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে

পৌছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরবের কোরাইশ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোন نَذِيْرٌ (ভয় প্রদর্শক) আগমন করেননি তখন نَذِيْرٌ বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ হবে এই যে, এ সম্প্রদায়ে মহানবীর পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌছেছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) -এর দ্বীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মুসা ইবনে ওক্‌বা থেকে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত করা হয়েছে যে, ওমর ইবনে নুফায়েল যিনি মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুওয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কোরাইশগণ বায়তুল্লাহ্ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুওয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—মূসা ইবনে ওকবাহ্ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশ্‌ত খেতেন না।

আবু দাউদ তাইয়ালেসী ওমর ইবনে নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে (যিনি আশারায়ে-মোবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজীর খেদমতে আরয করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে, তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ফরমান যে, হাঁ, তাঁর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েয। তিনি কেয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। (রূহুল মা'আনী)

অনুরূপভাবে ওরাকাহ্ বিন নাওফেল যিনি হুযুর (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন—তিনি তওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহ্কে (সাঃ) দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ্র তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত —কোরআন যে সত্য এবং রসূলুল্লাহ্ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ, সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে এবং সূরায়ে মা'আরেজের আয়াতে রয়েছে — فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই—যা বয়ানুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। তফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন—সাহাবেয়ে কেরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ—তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ্ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ هما يومان ذكرهما الله تعالى فى كتابه الله تعالى اعلم بهما واكره ان اقول فى كتاب الله ما لا اعلم - অর্থাৎ, এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ্ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। (ইহা আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।)

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্বজগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এর প্রতিটি বস্তুই মূলতঃ এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন এরশাদ করেছেন। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যতঃ যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন—কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলোর কোনটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَىْءٍ এর অন্তর্গত। অর্থাৎ, যেসব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা—প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন-কামনা প্রভৃতিও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়।

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ — ইতিপূর্বে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থ একথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু → বীর্য। অতঃপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ
رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ
لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ
لَاَمْلَــَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا
نَسِيْتُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا
سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى
جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۡ وَّمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ
اَعْيُنٍ ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
فَاسِقًا ۭ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ
جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۭ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا
فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ
قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

(১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (১৫) কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। (১৬) তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (১৭) কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের জান্নাত। (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ — পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামত অস্বীকারকারিগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তবে এতে আল্লাহপাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয় — বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজরাঈল (আঃ)- এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে এখানে مَلَكُ الْمَوْتِ এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়তে রয়েছে الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ —অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে ملئكة বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ঈঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাঈল (আঃ) একাকী একাজ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে একাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মাবিয়োগ ও মালাকুল-মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ ঃ প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল-মউতের সামনে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার মত তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মারফূ হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী তাযকিরাতে এটি বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সাঃ) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন-আমি প্রত্যেক মুমিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা সমুদ্র সৈকতে বসবাস করছে—আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচ বার দেখে থাকি। এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ্র হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণ বিয়োগ ঘটান? উল্লেখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল -মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালেকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কেবল তার মর্যাদার দরুন—অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীত আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করে।—(কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়্যাহ্ বর্ণনা করেন)

এ বিষয়ই আবু শায়েখ, ওকাইলী, দায়লমী, প্রমুখ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা-স্তুতিতে মগ্ন। (এই

হল এগুলোর জীবন) যখন এদের গুণ-কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ্ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

অপর এক হাদীস রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ পাক আযরাঈল (আঃ)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি (আযরাঈল) নিবেদন করেন; হে প্রভু আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ আমি এর সুরাহা এভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্যরূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। —(কুরতবী)

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন —যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে— এসবই মৃত্যু দূত—মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসে, তখন মালাকুত-মউত মৃত্যু পথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহ্র বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ-ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকরূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে—চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।—(আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত—মাযহারী)

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের, মুশরেক ও কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুমিনগণের বিশেষ গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ পাকের যিক্র ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা, এরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিকর ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে রাখে।

তাহাজ্জুদের নামায ঃ অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামায—যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মায়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বলেলেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফে হজ্ব সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন—এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ) ও যাহহাক (রাঃ) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যাঁরা এশা ও ফজর উভয় নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ যারা এশার নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের যিক্রে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,—কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহবান করবেন,— হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরূপ-গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহবান জানাবেন। এ আওয়াজ শোনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য—(ইবনে-কাসীর।) এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।—(মাযহারী)

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ
الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ
بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ
مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَ
جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ
الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ
هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

(২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। (২৩) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্যে পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা যে বিষয়ে মত বিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তাই কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়ী-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদ্‌গত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল; কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ — الْأَدْنَىٰ অর্থ নিকটতম **عذاب الادنى (নিকটতম শাস্তি) বলে** ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (عذاب الاكبر) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্‌র দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ ঃ যার মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন, যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত না হয়— তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, (একটা) দুনিয়াতেই নগদ, (দ্বিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ—যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ — لقاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ —এ আয়াতে কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাস্‌সেরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لِّقَائِهِ -র 'যমীর' (সর্বনাম) কিতাব—অর্থাৎ কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আঃ)- কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না।

যেমন কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ —অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, لِّقَائِهِ -র যমীর (সর্বনাম) হযরত মূসা (আঃ)- এর দিকে ধাবিত হয়েছে এ আয়াতে হযরত মূসা (আঃ) -এর সাথে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আঃ)- এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মে'রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতঃপর কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত মূসাকে (আঃ) ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষুণ্ণ হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত ঃ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ —অর্থাৎ, আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন—যখন তাঁরা ধৈর্য্যধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে, জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দু'টি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে—(১) ধৈর্যধারণ করা, (২) আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ্ পাক যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলীই এর অন্তর্গত—যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন — আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবণান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা— উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা ঃ আল্লাহ্ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয়দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবতঃ কর্মের পূর্বে। এতে ইংগীত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে-কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন; তা এই — بالصبر واليقين تنال الامامة فى الدين — অর্থাৎ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দ্বারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। جرز শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোন বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহে অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়— ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদ্গত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। —সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধবস্ত হবে, গাছপালা মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। —যেমন মিসরের ভূমি। কিছুসংখ্যক তসফীরকার ইয়ামন ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।—যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমিই এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অর্ন্তগত—সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে—সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীরা সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ —অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? —আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।—আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ —অর্থাৎ, আপনি (সাঃ) তাদের বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো সেদিন তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ বয়ে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো, সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। তা ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে কিংবা পরকালে।

কোন কোন বিজ্ঞজন مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।

সূরা সেজদাহ সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝١ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٢ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
وَكِيْلًا ۝٣ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ
اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ
اَبْنَآءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝٤ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗ وَ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٥ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ
اَنْفُسِهِمْ ۚ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ ۗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى
بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ
تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۗ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝٦

সূরা আল-আহযাব

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত – ৭৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ।

(১) হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ্ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহ্‌ফুযে লিখিত আছে।

সূরা আল-আহযাব

সূরাতুল-আহযাব মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এর অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্ পাক সমীপে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সংশ্লিষ্ট। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসূল (সাঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক।

শানে নুযূল ঃ এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশে-পাশে বনু কোরায়জা, বনু নযীর, বনু কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী গোত্র বসবাস করত। রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর (সাঃ) খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন, এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমন কি ওদের দ্বারা কোন অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইবনে জরীর (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওলীদ ইবনে মুগীরা, মুগীরা ও শাইবা ইবনে রবীয়া মদীনায় পৌছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুযূরে পাকের খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করে যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন, তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।—(রূহুল-মা'আনী)

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফের ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবু-সুফিয়ান, ইকরিমা ইবনে আবু জাহ্‌ল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করলো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন, তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের একথা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সাঃ) এরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধি

চুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।—(রূহুল মা'আনী)

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনাবলীও উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আয়াতয়সমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে—প্রথম, اتَّقِ اللَّهَ অর্থাৎ, আল্লাহ্কে ভয় কর, দ্বিতীয় وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ —অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল—যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফেরদের অনুসরণ না করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীগণকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন- يا ادم - ياموسى - يانوح - يا ابراهيم প্রভৃতি। বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন (সাঃ)-কে কোরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে—তাঁর উপাধি—নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশে, তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যা একান্ত জরুরী ছিল।

এখানে মহানবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) আল্লাহ্ পাককে ভয় করার—অর্থাৎ, মক্কার মুশরেকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লংঘন করা না হয়। (দুই) মুশরেক, মুনাফেক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তিভংগ করা মহাপাপ—(কবীরা গোনাহ্) এবং উপরে শানে-নুযূল প্রসংগে কাফের মুশরেকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র— সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা—যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং اتَّقِ اللَّهَ —এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরেকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লংঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اتَّقِ اللَّهَ —এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরেক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত—তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, —তাঁর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহ্র রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোন মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না করেন—তাদেরকে অত্যধিক উঠাবসা, মেলামেশার সুযোগ না দেন। কেননা, এদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা ও শলা-পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বভাবতঃ তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয়, তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফেকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফেক থাকে না—পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়—এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফেকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরদের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযূল প্রসঙ্গে মুনাফেকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেননা, এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে; তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا —বলে আল্লাহ্কে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফেকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, যে আল্লাহ্ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়—মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফেকদের কোন কোন কথা এমনও ছিল যদ্দ্বারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ—যেন আপনি কাফের ও মুনাফেকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাকিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُونَ

ব্যবহার করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا —এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশবিশেষ। এরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহ্র উপরে ভরসা করুন। কেননা, অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দ্বীন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমতঃ বর্বর যুগে আরববাসীরা অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়তঃ নিজ পত্নীদের সম্পর্কে এপ্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার' বলা হতো ; তবে 'যিহার'কৃত সে স্ত্রী তার জন্যে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظهار এর উৎপত্তি ظهر থেকে—যার অর্থ—পিঠ।

তৃতীয়তঃ তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্যপুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো ; এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা—তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম—এ পোষ্যপুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন—বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তঃকরণ থাকে, না দু'টি অন্তঃকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজন জ্ঞাত। এজন্য সম্ভবতঃ এর অসারতার বর্ণনা অপর দু'টো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ-মাঝে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'যিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয়-যিহার ও পালক পুত্রের হুকুম—এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজীর (সাঃ) উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'টি ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল-খুশীমত হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য তা উদ্‌ঘাটন করে দেয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল—তাই বলা হয়েছে— وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ অর্থাৎ, এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে, তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই-যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'যিহার-এর' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মোজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যিহারের কাফ্ফারা আদায় করে ; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মোজাদালায়' যিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ – ادعياء – دعى -এর বহুবচন, যার অর্থ পালক ছেলে—আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দু'টি অন্তঃকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না ; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে ; সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সাঃ) বলে সম্বোধন করতাম। (কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন।) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

মাসআলা ঃ এদ্দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহবান করে, তা যদি নিছক স্নেহজনিত হয়—পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশে না হয়, তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যতঃ যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।—(রূহুল বয়ান, বায়যাবী)

এ ব্যাপারটা কুরাইশদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী (সাঃ)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ যায়েদ (রাঃ) তাঁর সন্তান ছিলেন না ; বরং পালক পুত্র ছিলেন। যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 'সূরায়ে আহ্যাবের' অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরেক ও মুনাফেকদের প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণাদান সম্পর্কিত ছিল। কেননা, কাফেররা হযরত যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নবের (রাঃ) সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠানকালে জাহেলী যুগের এই পোষ্যপুত্রজনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজের ছেলের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ - اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবীর (সাঃ) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর (সাঃ) হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমন কি তাঁর (সাঃ) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূরে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন : 'এমন কোন মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি (সাঃ) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নেই। যদি তোমাদের মনে চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াত-- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -পাঠ করতে পার।'

وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ —তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ—ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহ্কাম, যথা—পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়।

মাসআলা : উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের (রাঃ) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী কিংবা অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ - اولوا الارحام -শব্দগত

শব্দার্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত—চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ—যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (عصبات) বলে আখ্যায়িত করেছেন বা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী 'আসাবাতে'র মোকাবেলায় وَاُولُوا الْاَرْحَامِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনী আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফেকাহ্র এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই ; বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে الْمُؤْمِنِيْنَ এর পরে আবার وَالْمُهٰجِرِيْنَ এর উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এখানে 'মু'মিনীন' বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা, নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا -অর্থাৎ, উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোন অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে—নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য ওসিয়তও করা যাবে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾
لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ
الظُّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا
فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ
لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ
مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

(৭) যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার— (৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে। তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। (১১) সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার শুরুতে নবী করীম (সাঃ)-কে তাঁর উপর অবতারিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে ওহী অবতারিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন।" আর আলোচ্য আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ এর মাধ্যমে মুমিনগণের উপর পয়গম্বর (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব—অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ ঃ উল্লেখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, মেশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'রেসালত ও নবুওয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা আল্লাহ্ পাকের বাণী وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ

নবী (আঃ)-গণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুওয়ত ও রেসালত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (আঃ) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে—'মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।'

وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ —সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখের পর পাঁচ জনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এঁদের মধ্যে রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও وَمِنْكَ শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুওয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।—(মাযহারী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহ্‌যাব (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দু'রুকূ অবতীর্ণ হয়েছে।—যাতে মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র নানাবিধ অনুগ্রহরাজি এবং রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বিভিন্ন মু'জেযার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলীর দরুন কুরতুবী ও মাযহারীসহ সব বিশিষ্ট তফসীরকারকগণই আহ্‌যাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আহ্‌যাব যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ মহাবিপর্যয়ের সময়ে মুসলমানদের এক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে— وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا —অর্থাৎ

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا
لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ اَشِحَّةً
عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ
اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ
سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا
فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُوْنَ
الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ
بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا
قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَاَ
الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَ
صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

(১৬) বলুন! তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। (১৭) বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ্ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ্র জন্যে সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।

আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে—যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়—যেমন, মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য; বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ব ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা, পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাঁওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগল ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ
اِلَّا غُرُوْرًا —অর্থাৎ, যখন কপটবিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের এসব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বই কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যতঃ—বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের দু'শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণী—যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল এবং বলতে লাগল يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا –অর্থাৎ, হে ইয়াসরেববাসীরা! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণী যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত (সাঃ)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ অর্থাৎ, এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এ সবকিছুই মিথ্যা। আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি, অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা অতঃপর এদের করুণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসংগে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। — لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। এদ্বারা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাস্সেরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরীরূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাবের স্তরেই থাকবে।—তা আমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ
اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ
يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
اَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢٧﴾
يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾
وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ
اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ
لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

(২৩) মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ্ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। (২৮) হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহ্‌র জন্যে সহজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষে তিন আয়াতে বনু-কোরায়যার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল আহ্‌লে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ী মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমনসব ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ্ পাক যা চান তাই করেন।

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলী পরিহার করার প্রতি তাগিদ দেয়া, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট ও মর্ম বেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাঁর (সাঃ) আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) প্রতি কাফের ও মুনাফেকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফের ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সংগে সংগে সেসব নিষ্ঠাবান মুমিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযূর পাকের (সাঃ) প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌঁছে; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের (সাঃ) প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রাঃ) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ্ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত জাবেরের (রাঃ) রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) সমবেতভাবে রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্‌সের আবু হাইয়্যান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-মুহীতে প্রদান করেন যে, আহ্‌যাব যুদ্ধের পর বনু-নযীর

ও বনু-কোরায়যার বিজয় এবং গনীমতের মাল বণ্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) ভাবলেন যে, মহনবী (সাঃ) হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সাঃ)! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানীপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সংসর্গ এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবীজী (সাঃ) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল। ভাষ্যকার আবু হাইয়্যান বলেন যে, আহ্যাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী পত্নীগণের (রাঃ) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে পরবর্তী সূরায়ে তাহ্রীমে সবিস্তারে বর্ণিত হযরত যয়নবের (রাঃ) গৃহে মধুপানের কারণে স্ত্রীগণের (রাঃ) পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালাকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয় কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংক্রান্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আর্থিক দাবীই এর কারণ ছিল। কেননা, আয়াতে এরশাদ হয়েছে إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর .....।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রাঃ) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজীর (সাঃ) বর্তমান দারিদ্রপীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ—তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার আপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব—উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সাঃ) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা, তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কক্ষনো আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সংগে সংগেই আমি আরয করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রাঃ) কোরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না।—(তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ ও হাছান বলে মন্তব্য করা হয়েছে।)

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) একটি বৈশিষ্ট্য ঃ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ ও نُؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ এই দু আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের একটি পাপ অন্যদের দু'টি পাপের সমান হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সে আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজীর (রাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক তাঁদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গোনাহর বেলায় দ্বিগুণ শাস্তিলাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা, আল্লহ্ পাক তাঁদেরকে নবীজীর (সাঃ) পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন—তাঁদের গৃহে ওহী নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে।

فَاحِشَةٌ - بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ আরবী ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কোরআনে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাঙ্মুখ ছিল-অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল, যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মোতাহহারাত থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٌ অর্থ সাধারণ গোনাহ্ বা রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) কষ্টের কারণ হওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানে فَاحِشَةٌ শব্দের সাথে مُّبَيِّنَةٌ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, যেনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فاحشة مبينة

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا
نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى
وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾
اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ
الْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ
فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ
الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (৩৩) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে—মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (৩৪) আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। (৩৫) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহ্র অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়া। বিশিষ্ট মুফাসসেরগণের মধ্যে মোকাতেল ইবনে সোলাইমান এ আয়াতে 'ফাহেশা'র অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবী পেশ করা যা তাঁর (সাঃ) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।—(বায়হাকী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ -পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে এমনসব দাবী পেশ করতে বারণ করা হয়েছে; তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন তখন সাধারণ নারীদের তুলনায় এসময় তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত দান করা হয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্কাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' এতে হযরত মরিয়ম (আঃ) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়াই (রাঃ) তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিন জনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মার্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়-নবী পত্নী হিসেবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এদ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না—যা কোরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী।—(মাযহারী)

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ এরপর اِنِ اتَّقَيْتُنَّ আল্লাহ্ পাক তাঁদের নবী পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত। এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যেন তাঁরা নবীজীর (সাঃ) পত্নী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুতঃ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো

তাক্ওয়া এবং আহ্কামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

এরপর আযওয়াজে মোতাহ্হারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত ঃ নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা, যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এরপরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ অর্থাৎ, এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাঁটি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই শাখাবিশেষ।—(মাযহারী)

প্রথম হেদায়েতের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিৎ যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটও যেন ঘেঁষতে না পারে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন— যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে। 'নবী করীম (সাঃ) নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন।—(তাবারানী, মাযহারী)।

দ্বিতীয় হেদায়েত ঃ পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ —অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতযুগ বলে ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে—যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় একই রকম নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতা বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত ঃ এ যুগেরই অজ্ঞতা যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত—তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجَ শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে নিজের রূপ প্রদর্শন করা। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (অর্থাৎ, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রতমতঃ—প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্ পাকের নিকট নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য—গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুতঃ শরীয়ত-কাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয় ; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন, সামনে সূরা আহযাবেরই يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ —আয়াতে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় ঃ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমতঃ এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এই সূরার পরবর্তীতে উল্লেখিত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আযওয়াজে মোতাহ্হারাতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, 'প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' এছাড়া পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন, হজ্ব ও ওমরার সময় হুযূর (সাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর (সাঃ) সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে নিজেদের বাড়ী থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজীর (সাঃ) জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

শুধু হুযূরের (সাঃ) সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি ; বরং হুযূরের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীগণের হজ্ব ও ওমরার উদ্দেশে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামও (রাঃ) কোন আপত্তি তোলেননি।

সারকথা এই যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্ব-ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা, মুহ্রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে,

তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো—অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য ঃ

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ -আয়াতের আওতা বহির্ভূত। হজ্ব ও ওমরা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রাঃ) হজ্ব উপলক্ষে মক্কা তশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও বিশৃংখলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত নো'মান ইবনে বশীর, হযরত কা'ব ইবনে আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রাঃ) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌঁছেন। কেননা, হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেননি। বরং একাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু হযরত আলী (রাঃ) বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন, সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন (রাঃ) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মুমিনীন এসব বিদ্রোহীর বাড়াবাড়ির প্রতিকার এবং ওদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাবৃন্দ একথায় রাযী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা, তখন সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ সেখানে যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকার (রাঃ) খেদমতে আরয করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রাঃ) শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগে অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রাঃ)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন, তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই, তবে তা কার্যকরী হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) একদিকে আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীরা আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) মজলিসসমূহে সশরীরে শরীক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনের (রাঃ) এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে (রাঃ) অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছৃংখলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্যধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এসময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র (রাঃ) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) হযরত কা'কার (রাঃ) নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট এতদুদ্দেশে যদি উম্মুল মুমিনীনের (রাঃ) স্বীয় মুহরেম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে 'তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন' বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফেক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

নবীজীর বিবিগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েতঃ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সাঃ) অনুসরণ কর। দু-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার,—বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হল সর্বমোট পাঁচ হেদায়েত—যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচটি হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি

সমভাবে প্রযোজ্য ঃ উপরোক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ভূত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু'টি হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতিও একই হুকুম।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবিলতা ও কলুষতা বিমুক্ত করে দেয়া।

رِجْسٌ শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো প্রতিমা ও বিগ্রহ, আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।—(বাহরে মুহীত)

আয়াতে আহ্লে বাইতের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতাও আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গপদ عنكم ويطهركم ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সেরের মতে আহ্লে বায়েত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরিমা এবং হযরত মোকাতিল এমতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের রেওয়ায়েতও তিনি আহ্লে বায়েতের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) বলেই মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন—এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান-হুসাইনও আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাড়ী থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রাঃ) এঁরা সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সাঃ) এঁদের সবাইকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اللهم هؤلاء اهل بيتى (হে আল্লাহ্ এরাই আমার আহ্লে বাইত)।—(ইবনে জরীর)

ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতে মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। যারা বলেন যে, এ আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে—এবং আহ্লে বাইত বলে তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মতে অন্যান্যগণও—আহ্লে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহ্লে বাইতের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর এরশাদ মোতাবেক হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান-হুসাইন (রাঃ) ও আহ্লে বাইত।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

آيَاتِ اللهِ অর্থ কোরআন আর حكمت অর্থ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নত ও আদর্শ। যেমন, অধিকাংশ তফসীরকারগণ حكمت এর তফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اذْكُرْنَ শব্দে দু'টি ভাবার্থ হতে পারে—(১) এসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রাখা—যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোরআন পাকের যাকিছু তাঁদের গৃহে, তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেয়া।

ফায়েদা ঃ ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকট থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শোনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌঁছে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজীর (সাঃ) নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌঁছানো তাঁদের (পুণ্যবর্তী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কোরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ ঃ এ আয়াতে যেরূপভাবে কোরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হেকমত শব্দের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত মাআয (রাঃ) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) নিকট থেকে একখানা হাদীস শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্ব সাধাণের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু যখন তাঁর (মাআযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌঁছে দেয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মাআয হাদীসে-রসূল উম্মতের নিকট না পৌঁছানোর পাপে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই কোরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কোরআন পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।

কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার তাৎপর্য ঃ যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণতঃ সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিন্‌তে ইমরান ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআন পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ফেরাউন পত্নী ও امْرَأَتَ نُوحٍ নূহপত্নী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসার (সাঃ) সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।—(আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।)

কোরআন করীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীরা রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খেদমতে এ মর্মে আরয করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি—আল্লাহ্ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এদ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নেই। সুতরাং আমাদের কোন এবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত আস্‌মা বিনতে উমায়স (রাঃ) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সৎকার্যাবলী, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য ঃ ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের এবাদত। যথা-নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও জেহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে এবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কোরআন পাকের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র যিকর অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুমআ এবং এই সূরায় وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ্‌র যিকর যাবতীয় এবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মাআয ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নিকটে জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন্ ব্যক্তি হবে? তিনি (সাঃ) বললেন ঃ যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র যিকর করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহ্‌র যিকর সবচেয়ে বেশী করবে। এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ, সদ্‌কা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকর করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে।—(ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।)

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় এবাদতের মধ্যে যিকরই সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি—অযুসহ বা বিনা অযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহ্‌র যিকর করা যায়। এর জন্যে মানুষের কোন পরিশ্রমই করতে হয় না ; কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশী ও ব্যাপক যে, আল্লাহ্‌র যিকরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্মও এবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া ; বাড়ী থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ী ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্দেশিত দোয়া— প্রভৃতি দোয়াসমূহের সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ্ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোন কাজ না করে, আর তারা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয়, তবে পার্থিব কাজ দ্বীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।